রেলওয়ে-৩

যেভাবে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় রেলওয়ে

সুধীর কুমার ও শাশুন মেহরোত্রা

ভারতের জনগণের জীবন ও অর্থনীতিকে এক সুতায় গেঁথে রেখেছে ভারতীয় রেলওয়ে। ভারতের দরিদ্র জনগণ ও অর্থনীতি–উভয়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই রেলওয়ের। রেলওয়ে একদিকে লক্ষ কোটি মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের একমাত্র সস্তা মাধ্যম, অন্যদিকে বিদ্যুৎ, ইস্পাত কিংবা সিমেন্ট কারখানার কাঁচামাল, রেশনের দোকানে খাদ্যশস্য কিংবা কৃষকের কাছে সার পৌছানোর মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার কাজও করছে । প্রায় ১৪ লক্ষ কর্মী ও ১১ লক্ষ পেনশনভোগীর এই বিশাল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটি ২০০১ সালের দিকে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। এ সময় এর মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩৫৯ কোটি রুপি। অপারেটিং রেশিও বা পরিচালন অনুপাত (আয়ের তুলনায় খরচের হার) বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় ৯৮%, যার অর্থ ১ রুপি আয় করতে হলে ৯৮ পয়সা খরচ করতে হয়। সংস্থাটি এ সময় ভারত সরকারকে ডিভিডেন্ড দিতেও ব্যর্থ হয়।

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ ছিল তার একটা চিত্র পাওয়া যায় সে সময় ভারতীয় রেলওয়ে সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের গঠন করা মোহন কমিটির রিপোর্ট থেকে:

"সোজাসুজি বলতে গেলে, যেভাবে চলছে তাতে ভারতীয় রেলওয়ে খুব দ্রুত দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং আগামী ১৫ বছরের মধ্যে ভারত সরকারকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬১ হাজার কোটি রুপির দেনার ভার বহন করতে হবে...পরিচালনার পর্যায় থেকে দেখলে প্রতিষ্ঠানটি চিরঋণের ফাঁদে পড়েছে এবং শুধুমাত্র ক্রমবর্ধমান ভর্তুকির মাধ্যমেই এটিকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। আর সবাই জানে, ভর্তুকির জন্য কোনো বরাদ্দ নেই।

এ সময় ভর্তুকির মাধ্যমে এবং ১৭ হাজার কোটি রুপির বিশেষ রেলওয়ে নিরাপত্তা তহবিল গঠন করে ২০০৪ সাল নাগাদ রেলওয়ের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও আর্থিক সংকট আগের মতোই গুরুতর পর্যায়ে থেকে যায়। এরপর ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যায়ে লালুপ্রসাদ যাদবের নেতৃত্বে ভারতীয় রেলওয়ে পুরো ঘুরে দাঁড়ায়। কাঠামোগত সংস্কারের প্রচলিত প্রেসক্রিপশন, যেমন– বেসরকারীকরণ, ছাঁটাই ও ভাড়া বৃদ্ধির মতো কোনো পদক্ষেপ ছাড়াই এ ঘটনাটি ঘটেছে।

রেলওয়ের উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ২০০৫ সালে ৯ হাজার কোটি রুপি থেকে বেড়ে ২০০৬ সালে ১৪ হাজার কোটি এবং ২০০৬ সালে ২০ হাজার কোটি রুপিতে পৌঁছেছে। ২০০৭-০৮ পর্যায়ে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি রুপিতে পৌঁছবে। আমাদের অপারেটিং রেশিও ভালো হতে হতে ৭৬ শতাংশে নেমেছে। ভারতীয় রেলওয়ে ভারতের সরকারি একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি, আমাদের অর্জন, ডিভিডেন্ড পূর্ব উদ্বৃত্তের বিচারে, আমাদেরকে দুনিয়ার বেশির ভাগ ফরচুন ৫০০ কোম্পানির চেয়ে ভালো অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।" [সূত্র : রেলমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮]

> প্রায় ১৪ লক্ষ কর্মী ও ১১ লক্ষ পেনশনভোগীর এই বিশাল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটি ২০০১ সালের দিকে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে।

মোহন কমিটিসহ বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের প্রস্তাবের বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ করেই ভারতীয় রেলওয়ের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়। মোহন কমিটিসহ দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব ছিল যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি করার। রেলওয়ে উল্টো যাত্রীভাড়া হ্রাস করে। দরিদ্র যাত্রীদের জন্য ভাড়া তিন রুপি পর্যন্ত কমানো হয়। মোহন কমিটির প্রস্তাব ছিল লোক ছাঁটাই করার। লালুপ্রসাদ রেলওয়েকে উল্টো কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগান। যেমন : রেলওয়ে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ ও চতুর্থ শ্রেণির গ্যাঙম্যান হিসেবে নতুন করে ২০ হাজার কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। রেল স্টেশনে প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে মাটির ভাঁড়ে চা বিক্রি বাধ্যতামূলক করা হয়, রেলওয়ের কাজে সিনথেটিক কাপড়ের বদলে খাদি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়, যার ফলে গ্রামীণ কুটির শিল্পের উন্নতি হয়।

মোহন কমিটি রেলওয়ের কর্পোরেটাইজেশন করে রেলওয়ের কারখানা বেসরকারীকরণের পরমর্শ দেয়। রেল মন্ত্রণালয় উল্টো ডিজেল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিন, চাকা, যাত্রীবাহী কোচ তৈরির সক্ষমতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়। বিহারের ছাপড়ায় রেলের চাকা তৈরির কারখানা, মারুহারায় ডিজেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা এবং মাধেপুরায় ইলেকট্রিক ইঞ্জিন তৈরির কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তা ছাড়া ভারত সরকারের মালিকানায় থাকা বিহারের ভারত ওয়াগন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির দুটি মালগাড়ির বগি তৈরির রুগ্‌ণপ্রায় কারখানাও অধিগ্রহণ করে রেলওয়ে। মোহন কমিটি নতুন রেললাইন নির্মাণ ও ইউনিগেজ পলিসির মতো অলাভজনক খাতে বিনিয়োগের বিরোধিতা করলেও রেলওয়ে ২০১২ সালের মধ্যে ১৩ হাজার কিলোমিটার রেলপথ মিটার গেজ থেকে ব্রড গেজে রূপান্তরের ঘোষণা দেয়। মিটার গেজ থেকে ব্রড গেজে রূপান্তরের সুবিধা হলো অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরের দীর্ঘতর ও দ্রুততর ট্রেনে অপেক্ষাকৃত কম খরচে বেশি যাত্রী ও মালামাল পরিবহন এবং মিটার গেজ থেকে ব্রড গেজে ট্রেনে ট্রান্সশিপমেন্টের ঝামেলা হ্রাস। ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল নাগাদ আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি নতুন রেললাইন নির্মাণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা অলাভজনক যাত্রীবাহী ট্রেনের বদলে মালামাল পরিবহনের দিকে জোর দিতে বললেও ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল নাগাদ নতুন ১ হাজার ৫০০ যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করা হয়, যা এর আগের ৪ বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি।

যেভাবে ভাড়া না বাড়িয়েও যাত্রীসেবা লাভজনক করা হয়

ট্রেনপ্রতি আয় শুধু যাত্রীর কাছ থেকে পাওয়া ভাড়ার ওপর নির্ভর করে না, ভাড়া ছাড়াও আরো যেসব বিষয়ের ওপর ট্রেনপ্রতি আয় নির্ভর করে তার মধ্যে রয়েছে ট্রেনপ্রতি যাত্রীবাহী কোচের সংখ্যা, বিভিন্ন ধরনের যাত্রীবাহী কোচের কম্বিনেশন, কোচের যাত্রী ধারণক্ষমতা ও কোচের সিটের কত শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে (অকুপেন্সি রেট) তার হার ইত্যাদি।

ছক ১ : ২০০৩ সালে বিভিন্ন শ্রেণির যাত্রীবাহী কোচের জন্য প্রতি কোচ-কিলোমিটার থেকে আয়

যাত্রীশ্রেণি	তুলনামূলক ভাড়া	আয়/কোচ কি.মি (রুপি)	খরচ/কোচ কি.মি (রুপি)
সাব-আরবান	১	২২	৩৪
আনরিজার্ভড অর্ডিনারি	১	২২	৪১
মেইল এবং এক্সপ্রেস আনরিসার্ভড	১.৮২	২০	২৬
মেইল এবং এক্সপ্রেস রিসার্ভড স্লিপার সেকেন্ড ক্লাস	২.৯১	১৬	২৪
তৃতীয় শ্রেণির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	৮.১৯	৪০	২৯
দ্বিতীয় শ্রেণির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	১৩.১	৩৭	২৮
প্রথম শ্রেণির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত	২৫.৫	৩৭	২৬

সূত্র : স্ট্যাটিস্টিকস অ্যান্ড ইকোনমিক ডিরেক্টরেট, মিনিস্ট্রি অব রেলওয়ে, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, ২০০৮

ছক ১ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রথম শ্রেণির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচের ভাড়া সাব-আরবান কোচের ভাড়ার ২৬ গুণ হলেও কোচ-কিলোমিটার প্রতি আয় দ্বিগুণেরও কম। এর কারণ সাব-আরবান রেল প্রতি কোচে ৩০০ এর বেশি যাত্রী বহন করে আর প্রথম শ্রেণির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ যাত্রী পরিবহন করে মাত্র ১৮ জন। তা ছাড়া বেশি ভাড়া অনেক সময় কোচ-কিলোমিটার প্রতি আয় কমিয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণির মেইল এবং এক্সপ্রেস রিসার্ভড স্লিপার শ্রেণির কথাই ধরা যাক। এই শ্রেণির ভাড়া সাধারণ আনরিসার্ভড শ্রেণির ভাড়া থেকে প্রায় তিন গুণ অথচ আয় মাত্র ১৬ রুপি, যা সাধারণ আনরিসার্ভড শ্রেণির আয় ২২ রুপি থেকে ৩৬ শতাংশ কম। সাধারণ আনরিসার্ভড কোচ থেকে আয় বেশি, কারণ এই শ্রেণির কোচের যাত্রী ধারণক্ষমতা ৯০ (যা বাস্তবে আরো অনেক বেশি যাত্রী বহন করে) অথচ রিসার্ভড ক্লাসের যাত্রী ধারণক্ষমতা মাত্র ৭২। তাহলে কোচে কত যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে তাই এক্ষেত্রে নির্ধারক। সুতরাং কোচ-কিলোমিটার প্রতি আয় শুধু যাত্রী ভাড়ার ওপরই নির্ভর করে না, একেকটা কোচে কতজন যাত্রী বহন করা হচ্ছে তার ওপরও নির্ভর করে।

কোচের অকুপেন্সি রেট বা ধারণক্ষমতার কত শতাংশ যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর। কেননা একটি সিট খালি যাওয়া মানে যাত্রী থেকে আয়ের সুযোগ নষ্ট হওয়া। অকুপেন্সি রেট ১ শতাংশ বাড়লে ভারতীয় রেলের আয় ১০০ কোটি রুপি বাড়ে। অকুপেন্সি রেট শুধু কোচ ও ট্রেনের ধরনের ওপরই নির্ভর করে না, মৌসুমের ওপরও নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ি অঞ্চলের দিকের ট্রেনগুলো খুব জনপ্রিয়। আবার এই সময়ে মরু অঞ্চলগামী ট্রেনে যাত্রী তুলনামূলক কম। শীতকালে রাজস্থানে যখন পর্যটন মৌসুম শুরু হয়, ট্রেনের সিট ফাঁকা পাওয়া তখন মুশকিল। বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন রুটে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনের চাহিদা নির্ণয় করে এবং সে অনুযায়ী কোচের কম্বিনেশন করেও ট্রেনের আয় বাড়ানো যায়। মাত্র ২০% অকুপেন্সি রেটের একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচকে কোনো অজনপ্রিয় ট্রেন থেকে সরিয়ে জনপ্রিয় ট্রেনের সাথে সংযুক্ত করলে অকুপেন্সি রেট বেড়ে যায়। একটি ট্রেনে কোন্ ধরনের কোচ কয়টি থাকবে তার ওপরও ট্রেনপ্রতি আয় নির্ভর করে। রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণির কোচ ৭টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ৫টি এবং তৃতীয় শ্রেণির ২টি কোচথাকে। দেখা যায়, এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ থেকে আয় বেশি হয়। আবার কোচে সিটের লে-আউটের ওপরও কোচপ্রতি এবং ট্রেনপ্রতি আয় নির্ভর করে। যদি জনপ্রিয় কোনো ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচের আসন বিন্যাস পরিবর্তন করে ৬৪ জনের বদলে ৮০ জনের আসনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে কোচপ্রতি আয় বাড়তে পারে। ট্রেনপ্রতি আয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো ট্রেনে কোচের সংখ্যা বা ট্রেনের দৈর্ঘ্য। কোচের সংখ্যা বাড়লে ট্রেন থেকে আয় বাড়ে, কিন্তু খরচ সমানুপাতে বাড়াতে হয় না; কারণ রেলওয়ের অনেক খরচ কোচের সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন–রেললাইন, ইঞ্জিন, গার্ড, চালক, প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদির অনেক খরচই কোচের সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত নয়। ফলে দেখা যায়, যেসব রুটের ট্রেন অনেক জনপ্রিয় এবং কোচগুলো সব সময় যাত্রীবোঝাই হয়ে চলে, সেসব রুটের ট্রেনে কোচসংখ্যা বাড়ানো হলে আয় অনেক বৃদ্ধি পায়।

এভাবে যাত্রী ভাড়া থেকে মনোযোগ সরিয়ে কোচ ও ট্রেনপ্রতি আয় বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় অন্বেষণের মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রী বাবদ আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ গরীব রথ ট্রেনটির কথা বলা যায়। গরীব রথ ট্রেনকে বলা যেতে পারে ভারতীয় রেলওয়ের ন্যানো ভার্সন; যদিও ন্যানোর বেশ কয়েক বছর আগেই এটি চালু হয়েছে। গরীব রথ ট্রেনটি কম খরচে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যাত্রীসেবা দিয়ে থাকে। দিল্লি-মুম্বাই রুটের একটি সাধারণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেনের তুলনায় অর্ধেক ভাড়ায় গরীব রথ ট্রেনে চড়া যায়। গরীব রথ ট্রেনে কোচের সংখ্যা এবং কোচের যাত্রী ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে প্রতি একক খরচ হ্রাস করা হয়েছে। যেমন– সাধারণভাবে একটি ট্রেনে ১৭টি কোচ থাকে, কিন্তু গরীব রথ ট্রেনে থাকে ২৪টি। রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনের প্রতিটি তৃতীয় শ্রেণির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচের যাত্রী ধারণক্ষমতা ৬৪ হলেও গরীব রথ ট্রেনের কোচগুলোর যাত্রী ধারণক্ষমতা ৭৫। রাজধানীর চেয়ার কারে ৭০ জন যাত্রী ধরলেও গরীব রথ ট্রেনের চেয়ার কোচে যাত্রী ধরে ১০২ জন। এভাবে একটি স্ট্যান্ডার্ড ট্রেন যেখানে ৮১৬ জন যাত্রী বহন করে, গরীব রথ ট্রেন সেখানে তার দ্বিগুনেরও বেশি, ১৯২০ জন যাত্রী বহন করতে পারে। যেহেতু রেলওয়ের বেশির ভাগ খরচই স্থির এবং যাত্রীর সংখ্যার সাথে সম্পর্কহীন, তাই যাত্রীপ্রতি খরচ রাজধানী এক্সপ্রেসে ৮০ পয়সা হলেও গরীব রথ ট্রেনে তা মাত্র ৩২ পয়সা।

ছক ২ : গরীব রথ ট্রেনের সাথে রাজধানী এক্সপ্রেসের খরচের তুলনা

	সাধারণ রাজধানী ট্রেন	গরীব রথ
তৃতীয় শ্রেণির কামরায় যাত্রী ধারণক্ষমতা	৬৪ জন	৭৫ জন
চেয়ার কার	৭০ জন	১০২ জন
১৭ কোচের ট্রেন	৮১৬ জন	১২৩৩ জন
২৪ কোচের ট্রেন	১৩০২ জন	১৯২০ জন
যাত্রী-কি.মি. প্রতি খরচ	৮০ পয়সা (১৭ কোচের ট্রেন)	৩২ পয়সা (২৪ কোচের ট্রেন)

সূত্র : স্ট্যাটিস্টিকস অ্যান্ড ইকোনমিক ডিরেক্টরেট, মিনিস্ট্রি অব রেলওয়ে

জনপ্রিয় মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে বাড়তি কোচ যুক্ত করার মাধ্যমে রেলওয়ের আয় বেড়েছে। প্রতিটি বাড়তি কোচের মাধ্যমে ১ কোটি রুপি আয় বাড়ে, ফলে তিন হাজার বাড়তি কোচ যুক্ত করার মাধ্যমে তিন হাজার কোটি রুপি বাড়তি আয় এসেছে।

এসবের মাধ্যমে ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যায়ে যাত্রীর সংখ্যার কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট ছিল ৬% এবং আয়ের কম্পাউন্ড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট ছিল ১২%। আর তা অর্জিত হয়েছে ভাড়া না বাড়িয়ে উল্টো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাড়া কমানোর মাধ্যমে।

যেভাবে মালামাল পরিবহনের উন্নয়ন ঘটানো হয়

মালামাল পরিবহন রেলওয়ের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মালবাহী ট্রেন যাত্রীবাহী ট্রেনের তুলনায় বেশি লোড বহন করলেও উভয়ে একই ড্রাইভার, রেললাইন, সিগন্যাল ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যবহার করে। ফলে একটি মালবাহী ট্রেন যাত্রীবাহী ট্রেনের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি লোড বহন করলেও খরচ যাত্রীবাহী ট্রেনের তুলনায় দ্বিগুণেরও কম হয়। ভারী ট্রেনের জ্বালানি খরচ হালকা ট্রেনের জ্বালানি খরচের তুলনায় কিছুটা বেশি হলেও টন প্রতি হিসাব করলে খরচ তুলনামূলক কম। এ কারণে যাত্রীবাহী ট্রেনের প্রতি টন-কি.মি. খরচ ৭ রুপি হলেও মালবাহী ট্রেনের প্রতি টন-কি.মি. খরচ মাত্র ৫১ পয়সা। তা ছাড়া অনেক ভারী কাঁচামাল ডোর-টু-ডোর (উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ব্যবহারের কেন্দ্রে) সেবা দেওয়ার সক্ষমতা, বিপুল পরিমাণ পণ্য একত্রে পরিবহন ক্ষমতা ইত্যাদি কারণে মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলওয়ে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কথা। কিন্তু দেখা গেল, ১৯৫১ সালে স্থলভাগে পণ্য পরিবহনে ভারতীয় রেলওয়ের অংশীদারত্ব যেখানে ৮৯ শতাংশ ছিল, ২০০৪ সালে তা ৪০ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে।

রেলসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান হলেও গোটা পরিবহনজগতে একচেটিয়া নয়, তাকে প্রতিযোগিতা করতে হয় ট্রাক, জাহাজ, পাইপলাইন, বিমান ইত্যাদি মাধ্যমের সাথে। জ্বালানি পরিবহনে রেলওয়ের বদলে পাইপলাইনে হচ্ছে, স্টিল এবং সিমেন্ট ট্রাকের মাধ্যমে ও উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে জাহাজের মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞ কমিটি এর জন্য রেলওয়ের দুর্বল সেবা এবং সড়ক যোগাযোগের উন্নয়নকে দায়ী করল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব তো রেলওয়ের সমস্ত মালামাল পরিবহনের হারকে একই রকম প্রভাবিত করার কথা, কেন কাঁচামাল ও তৈরীকৃত পণ্যের বেলায় দুই ধরনের ঘটনা ঘটেছে? যেমন– স্টিল ও সিমেন্ট পরিবহনে রেলওয়ের ভাগ অনেক কমে গেলেও লৌহ আকরিক, কয়লাসহ খনিজ দ্রব্যের ভাগ তেমন একটা কমেনি।

লোহা ও স্টিল উভয়েই ভারী দ্রব্য হলেও এদের পরিবহনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। রেল সাধারণত লোহার মতো খনিজ দ্রব্যকে খনি থেকে কারখানায় পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে রেলের তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান রয়েছে। যেমন–টাটা স্টিল বছরে ৫০ লক্ষ টন স্টিল উৎপাদন করে। এর জন্য লৌহ আকরিক কাঁচামালের প্রয়োজন বছরে ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টন, অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ২২ হাজার টন। এই পরিমাণ লৌহ আকরিক ট্রাকে করে পরিবহন করতে হলে দৈনিক ২ হাজার ট্রাক ব্যবহার করতে হবে। ট্রাকের ভাড়া তুলনামূলক বেশি এবং বিভিন্ন দুর্গম স্থান থেকে লোহা পরিবহন করার কারণে রেলওয়ে এক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু স্টিল পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলওয়ে স্টেশন থেকে স্টেশনে সেবা দেয়। সাধারণত স্টিল কারখানা এবং স্টিল ব্যবহারের কেন্দ্রগুলোতে লোহার খনির মতো রেললাইন থাকে না। ফলে স্টিল পরিবহনের বেলায় সংশ্লিষ্ট স্টিল কোম্পানিকে স্টিল একবার স্টেশনে পৌঁছে দিতে হয়, আরেকবার স্টেশন থেকে সংগ্রহ করে নিতে হয়। ফলে রেলওয়ের ভাড়া ছাড়াও স্টেশনে পরিবহনের জন্য বাড়তি খরচ হয়। ফলে ভারতের ক্ষেত্রে হিসাব করে দেখা গেছে, দূরত্ব ৭৫০ কিলোমিটারের কম হলে রেলওয়ের ভাড়া তুলনামূলক কম হওয়া সত্ত্বেও রেলওয়ে ট্রাকের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে।

২০০৪ সালের আগে রেলওয়ের এই তুলনামূলক সুবিধাজনক ও অসুবিধাজনক অবস্থান বিবেচনা করে মালামাল পরিবহনের ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হতো না। লোহা তুলনামূলক সস্তা পণ্য বলে এর ভাড়া কম এবং স্টিল তুলনামূলক দামি পণ্য হওয়ার কারণে এর ভাড়া বেশি রাখা হতো। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাজারে রেলওয়ের তুলনামূলক সুবিধার কথা বিবেচনা করলে ভাড়ার হার উল্টো হওয়া উচিত, অর্থাৎ যেহেতু লোহার ক্ষেত্রে রেলওয়ে ডোর-টু-ডোর সেবা দিচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে ভাড়া কিছুটা বেশি এবং স্টিলের ক্ষেত্রে স্টেশন-টু-স্টেশন সেবার জন্য ভাড়া কিছুটা কম।

এ বিবেচনায় যেসব ক্ষেত্রে রেলওয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রয়েছে সেসব পণ্য পরিবহনের ভাড়া কিছুটা বাড়িয়ে এবং যেসব ক্ষেত্র দুর্বল অবস্থানে রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে পণ্যের ভাড়া কিছুটা কমিয়ে পণ্য পরিবহনের হারানো বাজার পুনরুদ্ধার করে মালামাল পরিবহন অধিক লাভজনক করেছে ভারতীয় রেলওয়ে। যেমন–খনি থেকে কারখানায় লৌহ আকরিক পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে তুলনমূলক সুবিধাজনক অবস্থান রয়েছে রেলওয়ের, সেটাকে কাজে লাগিয়ে লৌহ আকরিক পরিবহনের ভাড়া ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে স্টেশন থেকে স্টেশনে যেসব মালামাল পৌঁছে দেওয়া হয়, যেমন– পেট্রোলিয়াম বা স্টিল এর ক্ষেত্রে ভাড়া যথাক্রমে ৩৩ ও ২২ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। আবার যেসব রুটে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মালামাল পরিবহন করে ফিরে আসার পথে মালাবাহী বগিগুলোকে খালি ফিরতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে ফিরতি পথে মালামাল আকর্ষণ করার জন্য ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট বা ছাড় দেওয়া হয়েছে। একইভাবে পিক সিজনে ভাড়া কিছুটা বাড়িয়ে এবং অফপিক সিজনে ভাড়া কিছুটা কমিয়ে দিয়ে বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতাসক্ষম বা কম্পিটিটিভ থাকা ও ক্যাপাসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

> মোহন কমিটি রেলওয়ের কর্পোরেটাইজেশন করে রেলওয়ের কারখানা বেসরকারীকরণের পরমর্শ দেয়। রেল মন্ত্রণালয় উল্টো ডিজেল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিন, চাকা, যাত্রীবাহী কোচ তৈরির সক্ষমতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়। বিহারের ছাপড়ায় রেলের চাকা তৈরির কারখানা, মারুহারায় ডিজেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা এবং মাধেপুরায় ইলেকট্রিক ইঞ্জিন তৈরির কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এর ফলাফলস্বরূপ রেলওয়ের মার্কেট শেয়ার আগে যেখানে কম ছিল, সেখানে মার্কেট শেয়ার ক্রমশ বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ স্টিল ও সিমেন্টের মতো ফিনিশড প্রোডাক্টের কথা বলা যায়। রেলওয়ে এর আগে দেড় দশক ধরে এসবের বাজার হারিয়েছে– ১৯৯১ সালে যেখানে স্টিল ও সিমেন্ট পরিবহনে রেলওয়ের মার্কেট শেয়ার ছিল যথাক্রমে ৬৭ ও ৫৯ শতাংশ, ২০০৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬ ও ৪০ শতাংশে। এইসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে স্টিল ও সিমেন্ট পরিবহনে রেলওয়ের মার্কেট শেয়ার আবার বাড়তে শুরু করে ২০০৮ সালে ৫০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং এর হার ক্রমশ বাড়ছে। ২০০৮ সালে স্টিল ও সিমেন্ট শিল্পের প্রবৃদ্ধি ছিল ৮-১০ শতাংশ, আর রেলওয়ের স্টিল ও সিমেন্ট পরিবহনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৫ শতাংশ, যার ফলে মার্কেট শেয়ার আরো ২ থেকে ৫ শতাংশ বেড়েছে।

এ তো গেল ডিমান্ড সাইড বা চাহিদাগত ব্যবস্থাপনার কথা। সাপ্লাই সাইড বা সরবরাহ ব্যবস্থায়ও নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে রেল সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির

মূলকথা হলো– দ্রুততর, দীর্ঘতর ও অপেক্ষাকৃত ভারী ট্রেন চালানোর মাধ্যমে প্রতি একক খরচ কমানো।

দ্রুততর : এখানে দ্রুততর বলতে ট্রেনের গতি নয়, বরং ট্রেন একবার মাল পরিবহন করে কত দ্রুত ফিরে এলো (টার্ন অ্যারাউন্ড) তা বোঝানো হচ্ছে। ২০০৪ সালে ভারতীয় রেলওয়ের মোট ৪ হাজার মালবাহী ট্রেন ছিল। গড়ে ৭ দিন টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম বা ফিরে আসার সময় হিসাবে দৈনিক ৫৭০টি ট্রেনে মালামাল লোড করতে পারত রেলওয়ে। টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কমিয়ে ৫ দিনে পরিণত করার মাধ্যমে দৈনিক ৫৭০টির বদলে ৮০০টি ট্রেনে মালামাল লোড করতে সক্ষম হয় ভারতীয় রেলওয়ে। অর্থাৎ মালমাল পরিবহনের জন্য বাড়তি ২৩০টি ট্রেন পাওয়া যায় প্রতিদিন। এর ফলে রেলওয়ের আয় বাড়ে ১০ হাজার কোটি রুপি।

অপেক্ষাকৃত ভারী: ২০০৪ সালে রেলওয়ে প্রতিদিন ৩০ হাজার ওয়াগনে মাল লোড করত, যা ২০০৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ হাজারে। এর সাথে যদি প্রতি ওয়াগনে বাড়তি ১ টন লোড যুক্ত করা যায় তাহলে আরো ৪০ হাজার টন বাড়তি যুক্ত হয়, যার অর্থ বছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন বাড়তি মালামাল পরিবহনের সক্ষমতা যুক্ত হওয়া। বাস্তবে ওয়াগনপ্রতি ৬ টন মালামাল বাড়তি পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়, যার ফলে প্রতিবছর বাড়তি ৯ কোটি টন মালামাল পরিবহনের ব্যবস্থা হয়, যার অর্থমূল্য ৬ হাজার কোটি রুপি।

একই ওয়াগনে আগের চেয়ে বেশি মালামাল পরিবহনের ব্যবস্থা করাটা সহজ ছিল না। এর জন্য এক্সেল লোড বাড়াতে হয়েছে। আর এক্সেল লোড বাড়ানো মানে নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হওয়া। ১৯৯০-এর দশকে ভারতীয় রেলওয়ে ৬ বিলিয়ন ডলার খরচ করে রেললাইনের মান উন্নয়ন করলেও এবং এসময় সিএএনএসি রেলওয়ে সার্ভিসেস, এডিবি এবং ইন্টারন্যাশনাল হেভি হল অ্যাসোসিয়েশনের মতো তিনটি প্রতিষ্ঠান পৃথক পৃথকভাবে রেললাইনের এক্সেল লোড ২৫ টন বলে সার্টিফিকেট দিলেও নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এক্সেল লোড ২০.৩ টন থেকে বাড়ানো যায়নি।

> গরীব রথ ট্রেনটি কম খরচে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যাত্রীসেবা দিয়ে থাকে। দিল্লি - মুম্বাই রুটের একটি সাধারণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেনের তুলনায় অর্ধেক ভাড়ায় গরীব রথ ট্রেনে চড়া যায়।

সকল আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা অতিক্রম করার জন্য প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু জায়গায় এক্সেল লোড বাড়ানো হয়। তারপর নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা কেটে গেলে সমস্ত জায়গায় তা বাস্তবায়ন করা হয়। ভারতীয় রেলওয়ের প্রতি ওয়াগনে ৪টি এক্সেল; প্রতিটি এক্সেলের লোড ২০.৩ টন থেকে বাড়িয়ে ২২.৯ টন করা হয়; কিন্তু নিরাপত্তা বিবেচনায় লোড কিছুটা কমিয়ে প্রতি ওয়াগনের লোড ৮ টনের বদলে ৬ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এর জন্য প্রতিটি ওয়াগনে বাড়তি ৪টি করে স্প্রিং যুক্ত করা হয়, বিভিন্ন স্থানের দুর্বল ট্র্যাক আপগ্রেড করা হয়, নিখুঁত লোড পরিমাপ ও ওভারলোড প্রতিরোধের জন্য ইলেকট্রনিক ওয়ে ব্রিজ ও ওয়াগন ইমপ্যাক্ট লোড ডিটেক্টর স্থাপন করা হয়। সেই সাথে বাড়তি হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন যুক্ত করা হয় বাড়তি ওজনসহ মাল বহন করার জন্য।

দীর্ঘতর: যাত্রীবাহী ট্রেনের মতো প্রতিটি মালবাহী ট্রেনের সাথেও বাড়তি ওয়াগন যুক্ত করে অর্থাৎ ট্রেনের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে মালামাল পরিবহনের সক্ষমতা বাড়ানো হয়। যেমন– কাভার্ড ওয়াগন ট্রেনের ক্ষেত্রে ওয়াগনের সংখ্যা ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৪১ করা হয় এবং খোলা ওয়াগনের ট্রেনের ক্ষেত্রে ওয়াগনের সংখ্যা বাড়িয়ে ৫৮ থেকে ৫৯ করা হয়। শুধু তা-ই নয়, ২০০৮-০৯ সাল থেকে ২০.৩ টন এক্সেল লোডের ওয়াগন বানানো বন্ধ করে শুধু ২২.৯ টন এক্সেল লোড বহন ক্ষমতাসম্পন্ন স্টিলের ওয়াগন বানানো শুরু করা হয়। নতুন ধরনের কাভার্ড ওয়াগনগুলো (বিসিএন টাইপ) আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ও নিজস্ব ওজন কম হওয়ায় কাভার্ড ওয়াগনবাহী মালবাহী ট্রেনের ওয়াগনসংখ্যা খোলা ওয়াগনবাহী ট্রেনের মতোই ৫৮-তে দাঁড়ায়। এর ফলে খোলা ওয়াগনবাহী ট্রেনের মাল পরিবহন ক্ষমতা ২৩০০ টন থেকে ৭৮% বৃদ্ধি পেয়ে ৪১০০ টনে উন্নীত হয়।

সব মিলিয়ে মালবাহী ট্রেনের মালামাল পরিবহন খরচ ১২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালের টনপ্রতি ৬১ পয়সা থেকে ২০০৮ সালে টনপ্রতি ৫৪ পয়সায় নেমে আসে। প্রতি টন মাল পরিবহন থেকে মালবাহী ট্রেনের আয় ২০০১ সালে ছিল ৭৪ পয়সা এবং লাভের হার ছিল ২১ শতাংশ। এককপ্রতি খরচ ৭ পয়সা কমে যাওয়ায় লাভের হার ২০০১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৮ সালে ৩৭ শতাংশে পৌঁছে যায়।

ভারতীয় রেলওয়ের এই অভিজ্ঞতা কি অনুকরণযোগ্য?

ভারতীয় রেলওয়ের এই ঘুরে দাঁড়ানো থেকে অন্যান্য সর্বজন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা নেওয়ার আছে অনেক কিছু। বেসরকারীকরণ, কর্পোরেটকরণ, শ্রমিক/কর্মী ছাঁটাই, ভাড়া/মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রচলিত প্রেসক্রিপশন ছাড়াও যে সর্বজন প্রতিষ্ঠান সফলভাবে চলতে পারে এই শিক্ষা রেলওয়ে ছাড়াও জ্বালানি, পানি সরবরাহ, সেচ, পরিবহন ইত্যাদি খাতে প্রয়োগ করা সম্ভব। এর জন্য কতগুলো কৌশল ও ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন প্রয়োজন। আমরা এখানে কোনো সুপারিশ বা প্রেসক্রিপশন দিতে চাই না, শুধু সাধারণ কতগুলো শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরতে চাই, যেগুলো রেলওয়ে ছাড়াও অন্যান্য সর্বজন খাতের রূপান্তরে কাজে লাগবে বলে আমরা মনে করি। তবে অবশ্যই এগুলো নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি আমলে নিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথমত, যে কোনো অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হলে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকতে হবে– আমলাদেরকে রাজনীতিবিদদের জনকল্যাণের অঙ্গীকারকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং রাজনীতিবিদদের উচিত হবে আমলাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে কোনো প্রভাব বিস্তার না করা।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের পরস্পর বিরোধিতা অনেক ক্ষেত্রেই এড়ানো সম্ভব, ভারতীয় রেলওয়ের অভিজ্ঞতা অন্তত তা-ই বলে। ভারতীয় রেলওয়ে এ বিষয়টি এড়ানোর জন্য প্রথমেই রেল পরিষেবার কোন অংশটি রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা শনাক্ত করেছে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছে বা পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থেকেছে।

তৃতীয়ত, দক্ষতা বা ইফিশিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য বিদ্যমান সম্পদ ও অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থত, নতুনভাবে চিন্তা করতে পারতে হবে। সর্বজন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেক সময় এ বিষয়ে জড়তা থাকে। এই জড়তা কাটিয়ে ব্যবসার ধরন, খরচ, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হতে পারে।

পঞ্চমত, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য– লক্ষ্য কিছুটা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা, বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় বাড়ানো, কৌশলগত বিনিয়োগ, ফলাফল অর্জনের পেছনে লেগে থাকা– এইসব ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে জোর দিতে হবে।

[**সুধীর কুমার ও শাশুন মেহরোত্রা** রচিত Bankruptcy to Billions: How the Indian Railways Transformed শীর্ষক পুস্তকের সারসংক্ষেপ সর্বজনকথার জন্য লিখেছেন **কল্লোল মোস্তফা**। সুধীর কুমার ভারতীয় রেলওয়ের এই রূপান্তরের সময়কালে রেল মন্ত্রণালয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন এবং রূপান্তরের নানা পলিসি তৈরি ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শাশুন মেহরোত্রা নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ফেলো। তিনি অবকাঠামো অর্থনীতি ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ক গবেষক ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা]